بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১২ জানুয়ারি, ২০২৪ মোতাবেক ১২ সুলাহ্, ১৪০৩ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

উহুদের যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে মহানবী (সা.)-এর জীবনী ও চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। এ সম্পর্কে অধিকতর বিস্তারিত বিবরণ হলো, মানুষের মধ্য হতে মহানবী (সা.) শত্রুর সবচেয়ে বেশি নিকটে ছিলেন আর তাঁর সাথে পনেরোজন (সাহাবী) অবিচল থাকেন। মুহাজিরদের মধ্য হতে যে আটজন ছিলেন (তারা হলেন,) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত তালহা (রা.), যুবায়ের (রা.), আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.), সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.) এবং আবু উবায়দা বিন জার্‌রাহ্ (রা.)। আর আনসারের সাতজন হলেন, হযরত হুব্বাব বিন মুনযের (রা.), আবু দুজানা (রা.), আসেম বিন সাবেত (রা.), হারেস বিন সিম্মা (রা.), সাহ্‌ল বিন হুনায়েফ (রা.) এবং সা'দ বিন মুআয (রা.)। কারো কারো মতে, সা'দ বিন উবাদা (রা.) এবং মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) ছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর সামনে ত্রিশজন (সাহাবী) অবিচল ছিলেন আর সবাই এ কথাই বলছিলেন যে, আমার মুখমণ্ডল যেন মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মুখকাফির মণ্ডলের সামনে থাকে এবং আমার প্রাণ তাঁর জীবন রক্ষায় নিবেদিত। তাঁর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক আর আমার প্রাণ তাঁর জন্য উৎসর্গিত হোক।

একটি রেওয়ায়েতে আছে, মহানবী (সা.)-এর সাথে এগারোজন (সাহাবী) এবং তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ রয়ে গিয়েছিলেন। আরেকটি রেওয়ায়েতে আছে, মুশরিকরা যখন মহানবী (সা.)-কে ঘিরে ফেলে তখন তিনি (সা.) সাতজন আনসারী সাহাবী এবং একজন কুরাইশ সাহাবীর মাঝখানে ছিলেন। অনুরূপভাবে আরেকটি রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, মহানবী (সা.) নয়জন সাহাবীর মাঝে একাই ছিলেন। (এদের মধ্যে) সাতজন আনসার এবং দুজন কুরাইশের মধ্য হতে, আর মহানবী (সা.) ছিলেন দশম।

বিভিন্ন রেওয়ায়েতে মহানবী (সা.)-এর সাথে যে-সব সাহাবী অবিচল ছিলেন তাদের সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা করা হয়েছে। (আমাদের) রিসার্চ সেল এক্ষেত্রে নিজেদের যে নোট দিয়েছে তাতে তারা বলেছে, ত্রিশজনের যে উল্লেখ পাওয়া যায় এর একটি ব্যাখ্যা এটিও হতে পারে যে, সে সময়ের দৃষ্টিকোণ থেকে সাহাবীদের সংখ্যা (হয়ত) পরিবর্তন হতে থাকে। যিনি পনেরোজন দেখেছেন তিনি পনেরোজন বলেছেন, যিনি যতজন দেখেছেন তিনি তাই বর্ণনা করেছেন। সাহাবীরা মহানবী (সা.)-এর কাছে আসা-যাওয়া করে থাকবেন, যে কারণে সংখ্যায় তারতম্য দেখা দিয়েছে। যাহোক, এটিই সঠিক বলে মনে হয়। কেননা, এটি পূর্বেই সাম্প্রতিক বিভিন্ন খুতবায় বর্ণিত হয়েছে যে, সাহাবীরা তাঁর পাশে একত্রিত হতেন; এরপর শত্রুর আক্রমণে নিরাপত্তা বলয় ভেঙ্গে যেতো, পুনরায় সমবেত হতেন। আসল কথা হলো, সাহাবীরা অবিচলতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। কারো মাঝে মৃত্যুর ভয় ছিল না। এটিও উল্লেখ পাওয়া যায় যে, উহুদের দিন মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের একটি দলের কাছ থেকে মৃত্যুর শর্তে বয়আত নিয়েছেন। বাহ্যত যখন মুসলমানরা পিছু হটে তখনও তারা অবিচল ছিলেন এবং নিজেদের জীবন বাজি রেখে মহানবী (সা.)-এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে থাকেন। এক পর্যায়ে তাদের মধ্য হতে কয়েকজন শহীদ হয়ে যান। সেদিন আটজন তাঁর পবিত্র হাতে মৃত্যুর শর্তে বয়আত করেন। এই বয়আতকারী সৌভাগ্যবানদের মধ্যে যে-সব নাম রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে সেগুলো হলো, হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত তালহা (রা.), হযরত

যুবায়র (রা.), হযরত সা'দ (রা.), হযরত সাহ্‌ল বিন হুনায়েফ (রা.), হযরত আবু দুজানা (রা.), হযরত হারেস বিন সিম্মা (রা.), হযরত হুব্বাব বিন মুনযের (রা.), হযরত আসেম বিন সাবেত (রা.)। তাঁদের মধ্য হতে কেউই শহীদ হন নি।

আল্লামা যামাখশারীর গ্রন্থ 'খাসায়েসে আশারা'তে উল্লিখিত আছে, উহুদের দিন হযরত যুবায়ের (রা.) পরম অবিচলতার সাথে মহানবী (সা.)-এর সঙ্গ দিয়েছেন এবং তিনি সেই সময় মহানবী (সা.)-এর হাতে মৃত্যুর শর্তে বয়আত করেছিলেন। অর্থাৎ এই মর্মে অঙ্গীকার করেছিলেন যে, মহানবী (সা.)-এর সুরক্ষায় নিজের প্রাণ বিসর্জন দিবেন, তবুও তাঁর (সা.)-এর সঙ্গ পরিত্যাগ করবেন না। সীরাত খাতামান্ নবীঈন গ্রন্থে হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা.) সাহাবীদের অবিচলতা এবং আত্মনিবেদন সম্পর্কে লিখেছেন:

যে-সব সাহাবী মহানবী (সা.)-এর চতুর্দিকে সমবেত ছিলেন, তারা যে আত্মনিবেদন প্রদর্শন করেছেন– ইতিহাস এর দৃষ্টান্ত উপস্থাপনে অপারগ। তাঁরা পতঙ্গের মতো মহানবী (সা.)-এর চতুষ্পার্শ্বে ঘুরছিলেন আর তাঁর খাতিরে নিজেদের জীবন বাজি রেখে (প্রাণপণ) লড়াই করছিলেন। যে আঘাতই আসত, সাহাবীরা তা বুক পেতে নিতেন এবং মহানবী (সা.)-এর সুরক্ষা করতেন আর একই সঙ্গে শত্রুদের ওপরও আক্রমণ রচনা করতেন। তিনি (রা.) আরও লিখেন,

এই গুটিকতক আত্মনিবেদিত (সাহাবী) সেই প্রবল বানের সামনে কতক্ষণ আর টিকতে পারতেন, যা প্রতিটি মুহূর্তে সর্বগ্রাসী তরঙ্গের ন্যায় চতুর্দিক থেকে ধেয়ে আসছিল! শত্রুর প্রতিটি আক্রমণের ঢেউ মুসলমানদেরকে কোথা হতে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যেত, কিন্তু আক্রমণের প্রকোপ কিছুটা প্রশমিত হতেই অসহায় মুসলমানরা লড়াই করতে করতে আবার নিজেদের প্রিয় মনিবের চতুষ্পার্শ্বে জড়ো হয়ে যেতেন। কখনও কখনও এমন ভয়াবহ আক্রমণ হতো যে, মহানবী (সা.) বাহ্যত একেবারেই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়তেন। যেমন এমন এক সময় আসে যখন মহানবী (সা.)-এর চতুর্দিকে কেবলমাত্র ১২জন সাহাবী অবশিষ্ট থাকেন, আর এমনও একটি সময় আসে যখন তাঁর চতুষ্পার্শ্বে কেবল দুজন সাহাবী-ই রয়ে গিয়েছিলেন। সেই আত্মনিবেদিতদের মাঝে হযরত আবু বকর (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত তালহা (রা.), হযরত যুবায়র (রা.), হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.), হযরত আবু দুজানা আনসারী (রা.), হযরত সা'দ বিন মু'আয (রা.) এবং হযরত তালহা আনসারী (রা.)-র নাম বিশেষভাবে উল্লেখ আছে।

এই উদ্ধৃতি থেকে মহানবী (সা.)-এর চতুষ্পার্শ্বে (উপস্থিত) সাহাবীদের সংখ্যার যে তারতম্য বিভিন্ন রেওয়ায়েতে পাওয়া যায়, তা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। যেমনটি আমি বলেছিলাম, আক্রমণের কারণে কখনও সংখ্যা কমে যেত আবার কখনও বৃদ্ধি পেতো।

মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে খ্রিষ্টানদের একটি অপবাদ খণ্ডন করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, খ্রিষ্টানরা অপবাদ দিয়েছে যে, মহানবী (সা.) নাকি মিথ্যা বলা বা ভিত্তিহীন কথা বলা বৈধ আখ্যায়িত করেছেন। তিনি (আ.) বলেন,

"আমাদের নেতা ও মনিব, পবিত্র নবী (সা.)-এর শিক্ষার এক অনন্য দৃষ্টান্ত এই স্থানে সাব্যস্ত হয় আর তা হলো, যেই তওরিয়াকে (বা দ্ব্যর্থবোধক কথাকে) আপনাদের ঈসা (আ.) মাতৃদুগ্ধের ন্যায় সারা জীবন ব্যবহার করেছেন, মহানবী (সা.) যতদূর সম্ভব এথেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।"

তওরিয়া'র আভিধানিক অর্থ হলো, মুখে কিছু বলা আর আর হৃদয়ে অন্য কিছু পোষণ করা। অর্থাৎ এমন কথা বলা যার দুটি অর্থ হতে পারে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তওরিয়া শব্দটিকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আভিধানিক অর্থ আমি বলে দিয়েছি। এর ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ভয়ের কারণে কোনো বিষয় গোপন রাখার উদ্দেশ্যে বা অন্য কোনো কারণে একটি বিষয়ের গোপনীয়তা রক্ষার উদ্দেশ্যে এমন সব রূপক ও

উপমার মাধ্যমে কথা বর্ণনা করা যেন বুদ্ধিমান লোকেরা সেসব কথা বুঝতে সক্ষম হলেও নির্বোধরা তা বুঝতে না পারে। অর্থাৎ প্রজ্ঞার সাথে এমনভাবে কথা বলা যা মিথ্যাও হবে না এবং বুদ্ধিমান আসল বাস্তবতা কী তা বুঝতে সক্ষম হয়, কিন্তু নির্বোধ ব্যক্তি তা বুঝতে না পারে; তার ধারণা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়। তিনি বলেন, কিন্তু এটি উন্নত মানের তাকওয়ার পরিপন্থী। হাদীস থেকে এটি প্রমাণিত হয় যে, এটি উন্নত পর্যায়ের তাকওয়ার পরিপন্থী। অতএব মহানবী (সা.)-এর ক্ষেত্রে এটি কখনো প্রমাণ করা সম্ভব নয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ সম্পর্কে যা বলেন তার সারাংশ হলো, খ্রিষ্টানদের ভাষ্য অনুযায়ী যে ব্যক্তিকে তারা খোদা মানে– তার অবস্থা হলো, তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে তিনি মিথ্যা বলেছেন। যাহোক এর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরে তিনি (আ.) বলেন,

"মহানবী (সা.) যথাসম্ভব এর থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। যেন কথার অর্থ বাহ্যিকভাবেও মিথ্যা-সদৃশ না হয়। কিন্তু কী বলব আর কীই-বা লিখব! আপনাদের ঈসা সাহেব সত্যের ক্ষেত্রে এতটা সাবধানতা অবলম্বন করতে পারেন নি। যে ব্যক্তি খোদা হওয়ার দাবি করে তার তো সিংহের ন্যায় পৃথিবীতে আবীর্ভূত হওয়া উচিত ছিল; সারা জীবন তওরিয়া অবলম্বন করে, মিথ্যা-সদৃশ সব কথা বলে এটি প্রমাণ করার কথা না যে, সে সেসব পরিপূর্ণ মানবদের অন্তর্ভুক্ত নয় যারা মৃত্যুর বিষয়ে ভ্রুক্ষেপহীন হয়ে শত্রুদের মোকাবিলায় নিজেকে প্রকাশ করে এবং খোদা তা'লার ওপর নির্ভর করে। আর কোনো স্থানে (তারা) ভীরুতা প্রদর্শন করে না। অর্থাৎ যে আল্লাহ্ তা'লার ওপর নির্ভর করে– সে এবং খোদার নবীরা কখনও ভীরুতা প্রদর্শন করেন না। এসব কথা স্মরণ করে আমার কান্না পায় যে, যদি কেউ এমন স্বল্প বুদ্ধির ঈসার এই দুর্বল অবস্থা এবং তওরিয়ার প্রতি, যা এক প্রকার মিথ্যা, আপত্তি করে– তাহলে আমরা এর কী উত্তর দেবো? আমি যখন দেখি, সৈয়্যদুল মুরসালীন (সা.) উহুদের যুদ্ধে একাকী অবস্থায় উন্মুক্ত তরবারির সামনে বলছিলেন যে, আমি মুহাম্মদ, আমি আল্লাহ্‌র নবী, আমি আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র। অপরদিকে আমি দেখি যে, আপনাদের ঈসা কম্পমান অবস্থায় নিজের অনুসারীদের এই মিথ্যা কথা শিখাচ্ছেন, কাউকে বলো না যে, আমিই ঈসা মসীহ্; অথচ এই কথা বললে কেউ তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয় না– আমার আশ্চর্যের কোনো সীমা থাকে না যে, হে আল্লাহ্! এই ব্যক্তিও কি নবী হতে পারে, খোদার পথে যার বীরত্বের অবস্থা এমন?

হযরত ঈসার ক্ষেত্রে এই আশ্চর্যের বহিঃপ্রকাশ আসলে খ্রিষ্টানদের অভিযুক্ত করার আদলে তিনি উত্তর দিয়েছেন। তাঁর বিশ্বাস এটি ছিল না যে, হযরত ঈসা নবী নন। তাঁর কথার অর্থ এটি ছিল না যে, হযরত ঈসা নবী নন। বরং তিনি বলেন, যে নবীকে তোমরা উপস্থাপন করো আর যাকে খোদার পুত্র আখ্যায়িত করো– তোমাদের পুস্তক অনুসারে এই হলো তার অবস্থা। তথাপি তোমরা মহানবী (সা.)-এর প্রতি আপত্তি করো যে, তিনি মিথ্যা বলা বা ভীরুতা প্রদর্শন করা বৈধ আখ্যা দিয়েছেন!

ইবনে ইসহাক লিখেছেন যে, কাফিররা যখন মহানবী (সা.)-কে ঘিরে ফেলে তখন মহানবী (সা.) বলেন, **মান রাজুলুন ইয়াশরী লানা নাফসাহ্**। অর্থাৎ, কে আছে যে আমাদের জন্য নিজেকে বিক্রি করে দেবে? তখন যিয়াদ বিন সাকান পাঁচজন আনসারী সাহাবীর সাথে দণ্ডায়মান হন; কেউ কেউ বলেন, তিনি ছিলেন আম্মারা বিন ইয়াযিদ বিন সাকান (রা.); তারা মহানবী (সা.)-এর সামনে বীরত্বের স্বাক্ষর রেখে একে একে শহীদ হতে থাকেন। এমনকি তাদের মধ্য থেকে শেষ ব্যক্তি ছিলেন যিয়াদ অথবা আম্মারা (রা.)। তারা লড়াই করতে থাকেন এমনকি তাদের শরীরে অনেক আঘাত লাগে। অতঃপর মুসলমানদের একটি দল ফিরে আসে আর মুশরিকদের মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে দূরে ঠেলে দেয়। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, যিয়াদ বিন সাকানকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তাকে যখন আনা হয় তখন তিনি তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছিলেন। তিনি (সা.) বলেন, তাকে আমার আরও নিকটবর্তী করো। তখন সাহাবীগণ তাকে মহানবী (সা.)-এর নিকটবর্তী করে দেন। তিনি (সা.) নিজের পবিত্র চরণ তার নিকটবর্তী করেন। তিনি (রা.) নিজের চেহারা মহানবী (সা.) পবিত্র চরণে রেখে দেন। হযরত যিয়াদ (রা.)-র মৃত্যু এমন অবস্থায়

হয়েছিল যখন তাঁর গাল মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চরণে ছিল আর তার দেহে চৌদ্দটি আঘাত লেগেছিল। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন যে, একটা সময় যখন কুরাইশের আক্রমণ ভয়াবহ রূপ ধারণ করে তখন মহানবী (সা.) বলেন, কে আছে যে এই সময় আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিজের জীবন উৎসর্গ করবে? এক আনসারীর কানে যখন এই আওয়াজ পৌঁছে তখন তিনি এবং আরও ছয়জন আনসারী সাহাবী উন্মাদের ন্যায় এগিয়ে আসেন এবং তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই তাঁর (সা.) আশেপাশে লড়াই করতে করতে জীবন বিলিয়ে দেন। যিয়াদ বিন সাকান (রা.) এই দলের প্রধান ছিলেন। যখন কাফিরদের এই আক্রমণ কিছুটা প্রশমিত হয় এবং অন্য সাহাবীরা চলে আসেন আর উক্ত স্থানও কিছুটা পরিষ্কার হয় তখন মহানবী (সা.) নির্দেশ দেন যে, যিয়াদকে তুলে আমার কাছে নিয়ে এসো, তিনি আহত অবস্থায় পড়েছিলেন। লোকেরা তাকে তুলে নিয়ে আসে আর মহানবী (সা.)-এর সম্মুখে উপস্থিত করে। সেই সময় যিয়াদ-এর মাঝে প্রাণের স্পন্দন কিছুটা বাকি ছিল, কিন্তু তিনি অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগের দ্বারপ্রান্তে ছিলেন। এমন অবস্থায় তিনি (রা.) অনেক চেষ্টা করে তার মাথা তুলেন এবং নিজের মুখমণ্ডল মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চরণে সমর্পণ করেন এবং এই অবস্থাতেই প্রাণ ত্যাগ করেন।

হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)-র শাহাদতের ঘটনায় লিখিত আছে যে, হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.) মহানবী (সা.)-এর সম্মুখে লড়ছিলেন এবং লড়াই করতে করতে শাহাদত বরণ করেন। তাঁকে (রা.) ইবনে কামিয়া শহীদ করে। ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে যে, উহুদের যুদ্ধের পতাকাবাহক হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.) পতাকা রক্ষার দায়িত্ব অতি উত্তমরূপে পালন করেন। উহুদের যুদ্ধের দিন হযরত মুসআব (রা.) পতাকা বহন করছিলেন আর ইবনে কামিয়া, যে অশ্বারোহী অবস্থায় ছিল, হযরত মুসআব (রা.)-র ডান হাতে তরবারি দ্বারা আঘাত করে এবং তা কেটে ফেলে যা দ্বারা তিনি পতাকা ধরে রেখেছিলেন। এতে তিনি (রা.) বাম হাত দিয়ে পতাকাটি ধরে ফেলেন। ইবনে কামিয়া তখন বাম হাতে আঘাত করে সেটিও কেটে ফেলে। তখন তিনি (রা.) উভয় বাহু দ্বারা ইসলামী পতাকাকে নিজের বুকের সাথে চেপে ধরেন। এরপর ইবনে কামিয়া তৃতীয়বার বর্শা দিয়ে আক্রমণ করে আর হযরত মুসআব-এর বুকে তা বিদ্ধ করে। বর্শা ভেঙে যায় ও হযরত মুসআব মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তখন বনু আব্দুদ্ দার গোত্রের দুই ব্যক্তি সুয়াইবাত বিন সা'দ বিন হারমালা এবং আবু রোম বিন উমায়ের অগ্রসর হন; আবু রোম বিন উমায়ের পতাকাটি ধরে ফেলেন এবং মুসলমানদের ফিরে আসা ও মদীনায় প্রবেশ করা পর্যন্ত তা তাঁর হাতেই ছিল। এটি এক ইতিহাস গ্রন্থে লিখিত আছে, কিন্তু অন্যান্য কতিপয় রেওয়ায়েত অনুযায়ী এরপর মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.)-র হাতে পতাকা দিয়েছিলেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এই ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, কুরাইশ সেনারা প্রায় চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছিল এবং মুহুর্মুহু আক্রমণ রচনা করে যাচ্ছিল। তা সত্ত্বেও মুসলমানরা হয়ত কিছু সময় পর নিজেদের সামলে নিতে পারত, কিন্তু নিষ্ঠুর ঘটনা যা ঘটে তা হলো, কুরাইশের এক নির্ভীক সৈনিক আবদুল্লাহ্ বিন কামিয়া মুসলমানদের পতাকাবাহক মুসআব বিন উমায়ের (রা.)-র ওপর আক্রমণ করে এবং নিজের তরবারির আঘাতে তার (রা.) ডান হাত কেটে ফেলে। মুসআব (রা.) তাৎক্ষণিকভাবে অন্য হাতে পতাকা নিয়ে নেন আর ইবনে কামিয়ার মোকাবিলার জন্য সম্মুখে অগ্রসর হন, কিন্তু সে দ্বিতীয় আঘাতে তার (রা.) অপর হাতও কেটে ফেলে। তখন মুসআব (রা.) নিজের দুই কাটা হাত একত্রিত করে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে ইসলামী পতাকা সমুন্নত রাখার চেষ্টা করেন। এরপর ইবনে কামিয়া তৃতীয় আক্রমণ করে আর এবার মুসআব (রা.) শহীদ হয়ে পড়ে যান। পতাকা তো তৎক্ষণাৎ অন্য কোনো মুসলমান এগিয়ে এসে ধরে ফেলেন, কিন্তু যেহেতু মুসআব (রা.)-র দেহের আকৃতি ও গঠনগড়ন মহানবী (সা.)-এর মতো ছিল তাই ইবনে কামিয়া ধরে নিয়েছিল যে, আমি মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করেছি। আবার এটাও হতে পারে, সে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ও ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই কৌশল অবলম্বন করেছিল। যাহোক, মুসআব (রা.) শহীদ হয়ে পড়ে গেলে সে হৈ চৈ আরম্ভ করে দেয়, আমি মুহাম্মদ

(সা.)-কে হত্যা করেছি। এই সংবাদে মুসলমানদের অবশিষ্ট মনোবলও হারিয়ে যায় এবং তাদের জমায়েত একেবারে বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

যেভাবে এখনই বর্ণনা করা হলো, উহুদের প্রান্তরে অল্প কিছু সময়ের অসতর্কতায় ইসলামী সেনাবাহিনীর বিজয় সাময়িক পরাজয়ে বদলে যায়। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা.)-ই পৃথিবীর যুদ্ধের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ সেনাপতি ও প্রজ্ঞাপূর্ণ ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণে দক্ষ বিবেচিত হন। তিনি (সা.) যুদ্ধের পরিবর্তিত পরিস্থিতির ওপর গভীর দৃষ্টি রাখেন। চারগুণ বড়ো সেনাবাহিনীর সামনে নিজের বিক্ষিপ্ত ও দুর্বল সেনাবাহিনীকে এভাবে নিরাপদ করেন যে, শত্রুপক্ষ ইসলামী সেনাবাহিনীকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার অশুভ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে পারে নি। হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)-র শাহাদতের পর মহানবী (সা.) ইসলামী সেনাবাহিনীর পতাকা হযরত আলী (রা.)-কে প্রদান করেন। তিনি (রা.) ইসলামী সেনাবাহিনীর পতাকা হাতে নিয়ে বিজয়ের নেশায় উন্মাদ শত্রুদের সামনে দাঁড়িয়ে যান। তার (রা.) তরবারি আঘাতের পর আঘাত করছিল, বিক্ষিপ্ত ইসলামী সেনাবাহিনীর আত্মবিশ্বাস পুনর্বহাল করছিল। হযরত আলী (রা.) রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পাশে সমবেত গুটিকয়েক ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত ইসলামী সেনাবাহিনীর ছোট্ট জামাতের সাথে একত্রিত হয়ে এমন যুদ্ধ করেন যে, মুশরিকদের ঘেরাও থেকে বের হওয়ার পথ তৈরি হয়ে গেল। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নেতৃত্বে এই ছোট্ট দলটি পথ তৈরি করে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত বিক্ষিপ্ত ইসলামী সেনাদলের দিকে অগ্রসর হয়, যারা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর শাহাদতের সংবাদ শুনে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে বসছিল। এজন্য মক্কার মুশরিকরাও ইসলামী সেনাবাহিনীর প্রত্যাবর্তনকে বিফল করার জন্য প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করে দেয়। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পেছনে সরে আসার প্রজ্ঞাপূর্ণ পদক্ষেপও এতই সফল ছিল যে, গুটিকয়েক সদস্যের দলটি অর্ধবৃত্তাকারে কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে শত্রুদের আক্রমণকে বিফল করে অলক্ষ্যে গিরিপথের দিকে সরে আসছিল। শত্রুরা পরিবেষ্টনের সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করে, কিন্তু তিনি (সা.) এই আক্রমণকারীদের ভিড় কেটে পথ তৈরি করেই নেন।

উহুদের যুদ্ধের সময় নিদ্রা ও তন্দ্রাচ্ছন্ন হওয়ার উল্লেখও পাওয়া যায়। সাহাবীরা যারা লড়ছিলেন তাদের ওপর ঘুমের অবস্থা ছেয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লা এমন কোনো অবস্থা সৃষ্টি করে দেন যার ফলে তাদের তন্দ্রা পেয়ে বসে। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো– হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.) বর্ণনা করেন, যখন উহুদের যুদ্ধের মোড় পরিবর্তন হলো তখন আমি দেখলাম, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে রয়েছি; তখন আমরা সবাই হতবিহ্বল ও ভীত ছিলাম আর আমাদের ওপর ঘুমের আবেশ সৃষ্টি করা হয়। এমন অবস্থা ছিল যে, মনে হচ্ছিল যেন আমাদের ওপর তন্দ্রাভাব চাপানো হয়েছে। আমাদের মাঝে একজনও এমন ছিল না যার চিবুক তার বুকের সাথে লেগে যায় নি। অর্থাৎ ঘুম এবং তন্দ্রার অবস্থায় মাথা নীচের দিকে ঝুঁকে গিয়েছিল। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমার এমন মনে হচ্ছিল, আমি যেন স্বপ্নে মুআত্তেব বিন কুশায়ের (রা.)-র আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। তিনি বলছিলেন, যদি আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার থাকত তাহলে আমরা কখনো এখানে এভাবে নিহত হতাম না। মুআত্তেব বিন কুশায়ের (রা.) আনসারী সাহাবী ছিলেন। তিনি আকাবার বয়আত, বদরের যুদ্ধ ও উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আমি তার এই বাক্যটি মুখস্থ করে নিলাম।

উক্ত ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা নিম্নোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ করেন,

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِّنكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ۖ
يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ

অর্থ: **অতঃপর, তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের প্রতি দুঃখের পর প্রশান্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে তন্দ্রা অবতীর্ণ করেছিলেন যা তোমাদের এক দলকে আচ্ছাদিত করছিল। আর এক দল এমনও ছিল যাদের জীবন তাদের চিন্তিত**

করে রেখে ছিল, তারা আল্লাহ্‌র সম্পর্কে অজ্ঞতার যুগের ধারণা মতো অন্যায় ধারণা করছিল। তারা বলছিল, গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে কি আমাদের-ও কোনো ভূমিকা আছে? তুমি ঘোষণা করে দাও, সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার নিশ্চিতভাবে কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার। (আলে ইমরান: ১৫৫)

হযরত কা'ব বিন আমর আনসারী (রা.) বর্ণনা করেন, উহুদের যুদ্ধের দিন এক পর্যায়ে আমি আমার জাতির চৌদ্দোজনের সাথে মহানবী (সা.)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। সেই সময় আমরা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে যাই যা প্রশান্তিস্বরূপ ছিল, অর্থাৎ অত্যন্ত প্রশান্তিপূর্ণ তন্দ্রা ছিল। যুদ্ধাবস্থাতেও সেই তন্দ্রা আমাদেরকে স্বস্তি প্রদান করছিল। এমন একজন ব্যক্তিও ছিল না যার বুক থেকে হাপরের মতো নাক ডাকার শব্দ বের হচ্ছিলো না। তিনি বলেন, আমি বিশর বিন বারা বিন মা'রুরের (রা.) হাত থেকে তরবারি খসে পড়ে যেতে দেখেছি। অথচ তিনি তরবারি পড়ে যাওয়ার বিষয়টি অনুভবই করতে পারেন নি; অথচ মুশরিকরা আমাদের দিকে ধেয়ে আসছিল।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাবে.) এই আয়াতের তফসীর করতে গিয়ে লিখেছেন, হতে পারে তরবারি পড়ে যাওয়ার বিষয়টি তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। সেই সময় ঘুম তো ছিল, কিন্তু তার হাতে যে অস্ত্র ছিল তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা ছিল। তা পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলে ঝাঁকুনি লাগতো। যা-ই হোক, এখানে نُعَاس শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর তফসীর হচ্ছে, বিভিন্ন আঙ্গিকে أَمَنَةً نُّعَاسًا এর যে-সব অর্থ দাঁড়ায় সেসবের সার কথা হলো, কষ্টের পর তোমাদের প্রতি এমন প্রশান্তি অবতীর্ণ করা হয়েছে যাকে ঘুম বলা যেতে পারে। অথবা এমন তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেছেন যা প্রশান্তিদায়ক ছিল। অথবা এমন শান্তি প্রদান করা হয়েছে যা ঘুমের মতো প্রভাব রাখত, অথবা ঘুমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই أَمَنَةً نُّعَاسًا এর অর্থ হলো, তন্দ্রা- সাময়িকভাবে মাথা ঝুঁকিয়ে ধাক্কা খাওয়াকেও বলে। কিন্তু نُّعَاس -এর অর্থ তেমন তন্দ্রা নয়, বরং ঘুম ও জাগরণের মধ্যবর্তী অবস্থা হয়ে থাকে। ঘুমানোর আগে মধ্যবর্তী এমন একটি অবস্থা তৈরি হয় যখন শরীরের সকল স্নায়ু এক প্রকার প্রশান্তি বোধ করে; সেটিই এক গভীর প্রশান্তি। সেই প্রশান্তিকর অবস্থা যদি চলমান থাকে তবে তা পরে ঘুমে রূপান্তরিত হয়। আর তন্দ্রার অবস্থায় যদি মানুষ হাঁটতে থাকে তাহলে মানুষ পড়বে না, ঠিক পড়ার উপক্রম হলে তার ঝাঁকুনি লাগবে; সে বুঝতে পারে, আমি কী অবস্থায় ছিলাম। কিন্তু যদি ঘুমিয়ে যায় তবে তার স্নায়ু এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। যাহোক, হতে পারে সেই সময়ে বিশর বিন বারা (রা.)-র এমন অবস্থায় গভীর ঘুমও পেয়ে থাকবে। কিন্তু যুদ্ধাবস্থা হওয়া সত্ত্বেও সেই অবস্থাটি ছিল প্রশান্তিকর। এমন অবস্থায় মানুষ পড়ে যায়। যদি এটিকে সঠিকও ধরে নেওয়া হয় তবে সেই কারণেই হয়ত তার হাত সামান্য ঢিলে হয়ে তরবারি পড়ে যায়। যাহোক, এটি এমন একটি অবস্থা যাতে তৎক্ষণাৎ বুঝাও যায় যে, আমি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হচ্ছি; তখন মানুষ ঝটকা লেগে জেগে ওঠে। সুতরাং, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি তোমাদেরকে এমন প্রশান্তিকর অবস্থায় উপনীত করেছি যা ঘুমের সদৃশ ছিল। কিন্তু ঘুমের মতো এতোটা গভীর ছিল না যে তোমাদের নিজেদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণই থাকবে না। সেটি প্রশান্তি তো দিচ্ছিল কিন্তু তোমাদেরকে অকর্মণ্য করছিল না।

অনুরূপভাবে হযরত আবু তালহা (রা.) বলেন, আর এটি বুখারীর হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, উহুদের যুদ্ধের দিন ঠিক যুদ্ধের সময়ে তন্দ্রা আমাদের আচ্ছন্ন করে, আর এটি সেই তন্দ্রা যার উল্লেখ ইতঃপূর্বে করা হয়েছে। হযরত তালহা (রা.) বলেন, তরবারি আমার হাত থেকে পড়ে যাবার উপক্রম হলেই আমি সেটি ধরে ফেলতাম। অতএব এই হাদীস বলছে, ঘুমের অবস্থা এমন ছিল না যে, হাত থেকে জিনিস নীচে পড়ে যাবে বা হাঁটতে হাঁটতে আমরা পড়ে যাব। প্রশান্তি ছিল, স্বস্তি ছিল, কিন্তু তবুও নিজেদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ওপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ ছিল। অতঃপর পড়ে যাবার উপক্রম হলে দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে ফেলতাম। অর্থাৎ এই তন্দ্রাভাব হঠাৎ আসে নি, বরং এটি একটি পরিস্থিতি ছিল যা এসব মানুষের ওপর কিছুক্ষণ বিরাজমান ছিল।

তিরমিযীর তফসীর অধ্যায়ে হযরত আবু তালহা (রা.)-র পক্ষ থেকে রেওয়ায়েত রয়েছে, উহুদের যুদ্ধের দিন মাথা উঁচু করে তাকালে প্রত্যেককে ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে স্ব-স্ব ঢালের নীচে ঝুঁকতে দেখি। জেগে থাকার কারণে কিংবা ক্লান্তির কারণে এই সাহাবীরা ছিলেন অবসন্ন। এহেন অবস্থায় আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এই প্রশান্তিকর অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। দৃশ্যটি সার্বজনীন ছিল, এমন নয় যে হঠাৎ কোনো সৈন্যের ওপর চেপে বসা অবস্থা ছিল। বরং পুরো বাহিনী যারা মহানবী (সা.)-এর সাথে যুদ্ধে শত্রুদের বিপরীতে অনড় ছিলেন, তাদের সবার ওপর মনে হলো যেন আকাশ থেকে একটি জিনিস অবতীর্ণ হয়েছে আর সে অবস্থা তাদেরকে আচ্ছন্ন করেছে। সেসময় তাদের নিজেদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে চনমনে করার, সেগুলোকে সতেজ করার জন্য এই প্রশান্তির ভীষণ প্রয়োজন ছিল আর সেটি ঘুমানোর সময় ছিল না। অবস্থা যখন এমন অর্থাৎ এমন ক্লান্তিকর অবস্থা হলে মানুষের ওপর এ ধরনের অবস্থা ছেয়ে যায়। যাহোক, গোটা জাতি যুদ্ধ চলাকালে যখন শত্রুর পক্ষ থেকে কঠিন বিপদের সম্মুখীন, এমন ঘুমের ঘোরে চলে যাওয়া একটি মু'জিযা যা কোনো কাকতালীয় বিষয় নয়। কিছু মানুষের সাথে এমনটি হয়ে যায় কিন্তু এটি কোনো আকস্মিক ঘটনা নয় বরং একটি মু'জিযা, আর আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে একটি বিশেষ প্রশান্তিকর অবস্থা তাদেরকে সেসময় প্রদান করা হয়েছিল।

যুহরীর বরাতে আল্লামা আব্দুর রাজ্জাক রেওয়ায়েত করেন, মহানবী (সা.)-এর জ্যোতির্মণ্ডিত চেহারায় ওপর উহুদের দিন তরবারি দিয়ে সত্তরটি আঘাত করা হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে (সা.) এসব অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেছিলেন।

ইবনে হাজর আসকালানী বর্ণনা করেন, হতে পারে যুহরী সত্তর বলতে প্রকৃত অর্থে সত্তরই বুঝিয়েছেন বা সত্তর বলে অগণিত বুঝাতে চেয়েছেন। হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

যুদ্ধে তাকে সর্বাধিক সাহসী মনে করা হতো যে মহানবী (সা.)-এর পাশে থাকত, কেননা তিনি (সা.) অনেক ভয়াবহ স্থানে থাকতেন। সুবহানাল্লাহ্! কতই–না অতুলনীয় মর্যাদা। উহুদের প্রান্তরে দেখো! উপর্যুপরি তরবারির আঘাত আসে। এত তুমুল যুদ্ধ হচ্ছিল যে, সাহাবীরা সহ্য করতে পারছিলেন না; কিন্তু এই সাহসী পুরুষ বুক পেতে দিয়ে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করছিলেন। এতে সাহাবীদের কোনো দোষ ছিল না। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। এতে এই রহস্য নিহিত ছিল, অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর বীরত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। তিনি (আ.) বলেন, এক সময় উপর্যুপরি তরবারির আঘাত আসছিল আর তিনি (সা.) আল্লাহ্‌র নবী হওয়ার দাবি করছিলেন যে, আমি আল্লাহ্‌র রসূল মুহাম্মদ। তিনি (আ.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর কপালে সত্তরটি আঘাত লাগে, কিন্তু এসব আঘাত হালকা ছিল যা এক মহান ঘটনা ছিল।

মহানবী (সা.)-এর গর্তে পড়ে যাবার ঘটনা সম্পর্কে রেওয়ায়েত যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তা হলো, ফাসেক আবু আমের উহুদের ময়দানে বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলো গর্ত খুঁড়ে রেখেছিল যেন মুসলমানরা অজান্তে সেগুলোতে পড়ে যায় এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মহানবী (সা.) অজান্তে সেগুলোর একটিতে পড়ে যান। তিনি অজ্ঞান হয়ে যান এবং তাঁর দুই হাঁটুতে আঘাত পান। হযরত আলী (রা.) ত্বরিতগতিতে অগ্রসর হয়ে তাঁকে (সা.) ধরে ফেলেন এবং হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.) মহানবী (সা.)-কে খাদ থেকে ওপরে তুলে আনেন। হতভাগা ইবনে কামিয়ার কারণে মহানবী (সা.) খাদে পতিত হয়েছিলেন, কেননা সে মহানবী (সা.)-এর ওপর আক্রমণ করে তরবারির আঘাত হেনেছিল। তরবারি তাঁর (সা.) ঘাড়ে এসে আঘাত হানে। তরবারির কোপ তাঁর (সা.) কোনো ক্ষতি করতে পারেনি, কিন্তু এর আঘাতের ফলে তাঁর পবিত্র ঘাড়ে এত তীব্র আঘাত আসে যে, এরপর এক মাস বা ততোধিক কাল পর্যন্ত তাঁর ঘাড়ে কষ্ট ছিল। একই সাথে সে পাথর ছুঁড়তে থাকে আর একটি পাথর এসে তাঁর পাঁজরে লাগে। অন্যদিকে উতবা বিন আবী ওয়াক্কাস, যে কিনা হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.)-র ভাই ছিল, সে মহানবী (সা.)-কে লক্ষ্য

করে একটি পাথর সজোরে নিক্ষেপ করে যা তাঁর (সা.) মুখে আঘাত হানে। এর ফলে তাঁর (সা.) নীচের মাড়ির সামনের দুটো দাঁত ও ছেদন দাঁতের মাঝের একটি দাঁত ভেঙে যায়। এরই সাথে নীচের ঠোঁট ফেটে যায়। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী বর্ণনা করেন, দাঁতের একটি অংশ ভেঙে গিয়েছিল, মাড়ি থেকে উপড়ে যায় নি। হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.) যিনি এই উতবার ভাই ছিলেন, তিনি যখন জানতে পারেন যে, মহানবী (সা.)-কে আক্রমণকারী তার ভাই ছিল, তখন তিনি প্রতিশোধের নেশায় তার পশ্চাদ্ধাবন করে সৈন্যবাহিনীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। তিনি বর্ণনা করেন, সেসময় তাকে হত্যা করার যে প্রবল বাসনা আমার মাঝে ছিল হয়তবা পৃথিবীর আর কোনো কিছুর প্রতি কখনো এতটা হয় নি। কিন্তু উতবা তাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যায়। তিনি (রা.) পুনরায় তার সন্ধানে যান, কিন্তু সে প্রতিবারই কৌশলে পালিয়ে যায়। তৃতীয়বার যখন যেতে উদ্যত হন তখন মহানবী (সা.) হযরত সা'দ (রা.)-কে বলেন, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! তোমার কি মরার ইচ্ছা আছে? হযরত সা'দ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) এভাবে নিষেধ করায় আমি ক্ষান্ত হই। মহানবী (সা.) উতবা বিন আবী ওয়াক্কাসের বিরুদ্ধে এই দোয়া করেছিলেন যে, আল্লাহুম্মা লা ইয়াহুলু আলাইহিল হাওলু হাত্তা ইয়ামুতা কাফিরান, অর্থাৎ হে আল্লাহ্! এক বছর অতিবাহিত হওয়ার আগেই যেন সে কাফির অবস্থায় মারা যায়। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর (সা.) দোয়া এভাবে কবুল করেছেন যে, সে দিনই হযরত হাতেব বিন আবী বালতা (রা.) তাকে হত্যা করেন। হযরত হাতেব (রা.) বলেন, আমি যখন উতবা বিন আবী ওয়াক্কাসের লজ্জাজনক ধৃষ্টতা দেখলাম তখন চটজলদি মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করি, উতবা কোন্ দিকে গেছে? তিনি (সা.) সেদিকে ইশারা করেন যেদিকে সে গিয়েছিল। আমি সাথে সাথে তার পিছু ধাওয়া করি, পরিশেষে এক স্থানে তাকে ধরতে সক্ষম হই। আমি তৎক্ষণাৎ তার ওপর তরবারির আঘাত হানি যার ফলে তার মস্তক ছিন্ন হয়ে দূরে ছিটকে পড়ে। আমি অগ্রসর হয়ে তার তরবারি ও ঘোড়া হস্তগত করে মহানবী (সা.)-এর সমীপে তা নিয়ে উপস্থিত হই। মহানবী (সা.) এই সংবাদপ্রাপ্ত হয়ে দুই বার বলে ওঠেন, **রাযিয়াল্লাহু আনকা, রাযিয়াল্লাহু আনকা, অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, আল্লাহ্ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট।**

এই আক্রমণের ফলে মহানবী (সা.)-এর মাথায় যে শিরস্ত্রাণ ছিল সেটিও ভেঙে যায়। এছাড়াও শত্রুর উপর্যুপরি আক্রমণের ফলে তাঁর পবিত্র চেহারা ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় এবং চামড়া কেটে যায়। মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চেহারার ওপর আক্রমণকারীদের মাঝে একজন ছিল আব্দুল্লাহ্ বিন শিহাব যুহরী, পরবর্তীতে সে ইসলাম গ্রহণ করে। এর বিবরণ চলমান আছে, ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করা হবে।

এখন আমি কয়েকজন প্রয়াতের স্মৃতিচারণ করতে চাই। প্রথম স্মৃতিচারণ মুকাররম আবু হিলমী মুহাম্মদ উকাশা সাহেবের। তিনি ফিলিস্তিনের অধিবাসী ছিলেন। শরীফ ওদে সাহেব তার সম্পর্কে লিখেন, কিছুদিন পূর্বে গাজা এলাকার আমাদের আহমদী ভাই মুহাম্মদ উকাশা সাহেবকে নির্মমভাবে শহীদ করা হয়েছে। তার শবদেহ তার বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে পাওয়া যায়, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুম পরম নিষ্ঠাবান আহমদী ছিলেন। তার বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। নিজের পৈত্রিক গ্রাম থেকে হিজরত করে গাজার জাবালিয়ায় শরণার্থী শিবিরে থাকতেন। তার সাত পুত্র এবং পাঁচজন কন্যা আর পঁয়ত্রিশজন দৌহিত্র-দৌহিত্রি রয়েছে। তার একজন দৌহিত্র বলেন, কয়েক সপ্তাহ যাবৎ তার সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল। সাময়িক যুদ্ধবিরতির সময় তাকে খুঁজতে যাই কিন্তু তাকে ঘরে পাই নি। এরপর তার বাড়ি থেকে একশ' মিটার দূরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা লাশের মধ্যে তার মরদেহ পাওয়া যায়। মাথায় গুলি করে তাকে শহীদ করা হয়।

গাজার একজন আহমদী ইয়াসির শাহীন সাহেব বলেন, মরহুম দশ বছর আগে ডিশ অ্যান্টেনা লাগিয়ে আমাকে বলেন, এমটিএ চ্যানেল খুঁজে পেতে আমাকে সাহায্য করো। তখন তার মাধ্যমে আমি আহমদীয়াত সম্পর্কে জানতে পারি। কিছুদিন পর তিনি আমাকে বিস্তারিতভাবে জামা'ত সম্পর্কে অবগত করেন এবং কিছু বই-পুস্তক পাঠিয়ে দেন।

কিছুকাল আমাদের মাঝে ধর্মীয় বিতর্ক চলতে থাকে। এরপর আমি ইস্তেখারা করি এবং আমার স্ত্রীসহ বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করি। আমার বয়আত গ্রহণ করায় মোহাম্মদ উকাশা সাহেব ভীষণ আনন্দিত হন। এরপর আমাদের সম্পর্ক আরো দৃঢ় হয়। তিনি আমাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের তফসীর শোনাতেন। তফসীরে কবীর থেকে বিভিন্ন উদ্ধৃতি পড়ে শোনাতেন এবং নাসেখ-মনসুখের মতো বিষয়াদি বুঝাতেন। তার কথা বলার ধরন খুবই চিত্তাকর্ষক ছিল। দীর্ঘদিন যাবৎ একটি পুস্তক রচনা করছিলেন আর আমাকে ডেকে উক্ত পুস্তক থেকে পড়ে শোনাতেন এবং সেটিকে আরো পরিমার্জন করতেন আর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। তার ইচ্ছা ছিল, তার বাড়িটি সম্প্রসারিত করে তাতে একটি লাইব্রেরি স্থাপন করবেন যেখানে তিনি জামা'তের বই-পুস্তকের অনুলিপি রাখবেন। কিন্তু তার পরিবার আহমদীয়াতের কারণে তার প্রতি যুলুম-নির্যাতন করত তাই তার এই সদিচ্ছা পূর্ণ হয় নি। তার মাধ্যমেই গাজা জামা'তের সাথে আমার পরিচয় হয়। আমরা সবাই তার বৈঠকখানায় তার সাথে সাক্ষাৎ করতাম। তার জীবনের অন্তিম বছরগুলোতে অসুস্থতার কারণে তিনি প্রায়শই নিজের বাড়িতে থাকতেন এবং অতি কষ্টে হাঁটাচলা করতেন।

গাজার অপর একজন আহমদী ইয়ূজ সাহেব বলেন, মরহুম ছিলেন দীর্ঘকায়, শীর্ণদেহ এবং শুভ্র-শ্মশ্রুমণ্ডিত। তিনি যার সাথে কথা বলতেন স্বল্পতম সময়ে তার ওপর তার পুণ্য ও তাকওয়ার প্রভাব পড়ত। সর্বদা যিকরে ইলাহী এবং জামা'তের বইপুস্তক পাঠে ব্যস্ত থাকতেন। তার বড়ো আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, তার বাড়ির পাশেই যেন জামা'তের একটি মসজিদ নির্মিত হয়। ২০১৪ সালের যুদ্ধের পর তিনি নিজের হাতে একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন যাতে তিনি লেখেন, এমন একদিন আসবে যখন কবরগুলোর ওপর বোমা নিক্ষেপ করা হবে আর সেগুলোর ফলক ও পাথর এদিক-সেদিক ছড়িয়ে পড়বে। পরবর্তীতে সত্যিই এমনটি হয়েছে। প্রতিকূল পরিস্থিতি পরিবেষ্টিত হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেক সাক্ষাৎপ্রার্থীর সাথে হাস্যবদনে সাক্ষাৎ করতেন। তিনি ছিলেন খুবই উদার, মেধাবী এবং অন্যের মনের কথা খুব দ্রুত পড়তে পারতেন।

জনাব ইউসুফ নামে একজন ডাক্তার সাহেব বলেন, ভাই আবু হিলমী ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান সত্যিকার আহমদী। আহমদী হওয়ার পূর্বেই তার চিন্তাধারা ও কার্যাবলি আহমদীসুলভ ছিল, তাই জামা'তের সুসংবাদ পাওয়া মাত্রই বয়আত গ্রহণ করেন। বয়আত গ্রহণের পর তিনি মাশায়েখ ও আশপাশের লোকদের সাথে জামা'ত সম্পর্কে কথা বলতেন, ফলে তাকে নিজের আত্মীয়স্বজনের পক্ষ থেকে অনেক বিরোধিতা ও দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হয়েছে। শেষ বয়সে তিনি ক্রাচে ভর দিয়ে জুমুআ এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে সর্বাগ্রে উপস্থিত হতেন, অথচ তার অনেক কষ্ট হতো এবং পথিমধ্যে বিরোধীদের কারণে বিপদের সম্মুখীন হতে হতো। দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও চাঁদা অন্যদের আগে দিতেন। তার আকাঙ্ক্ষা ছিল জামা'ত ও এর দৃষ্টিভঙ্গি সমস্ত জগতে যেন বিজয় লাভ করে, কেননা এর মাঝেই রয়েছে মানুষের সকল সমস্যার সমাধান। তিনি নিজের বাড়ি ও জমির একাংশ জামা'তকে প্রদান করার বাসনা রাখতেন যেন সেখানে জামা'তের মসজিদ ও জামা'তের কেন্দ্র স্থাপিত হতে পারে, কিন্তু তার বিরোধী আত্মীয়স্বজন এ কাজে অন্তরায় হয়। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তার সন্তান-সন্ততিকেও তার দোয়ার উত্তরাধিকারী করুন। তার সন্তান-সন্ততি ও পরিবার যেন আহমদীয়াত ও প্রকৃত ইসলামকে অনুধাবন করতে পারে এবং শান্তি ও নিরাপত্তার মাঝে থাকতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করুন। অত্যাচারীদের প্রতিহত করুন এবং অত্যাচারীদের নির্মূল করুন।

ইসরাঈল এখন লেবানন সীমান্তেও হিযবুল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করতে যাচ্ছে এবং এর ফলে অবস্থার আরো অবনতি ঘটবে। অনুরূপভাবে আমেরিকা ও যুক্তরাজ্যের ইয়েমেনের হুথি গোত্রগুলোর বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ আরম্ভ করেছে–

এ বিষয়গুলো যুদ্ধকে আরো বিস্তৃত করছে। এখন অনেক লেখক এটিও লিখছে যে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আভাস আরো সন্নিকট মনে হচ্ছে। কাজেই, অনেক দোয়ার প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে বিবেকবুদ্ধি দান করুন।

আরেকজন মরহুমার স্মৃতিচারণ রয়েছে। তিনি জার্মানির মুরব্বী সিলসিলাহ্ হায়দার আলী জাফর সাহেবের স্ত্রী আমাতুন্ নাসীর জাফর সাহেবা। অতি সম্প্রতি তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আল্লাহ্‌র কৃপায় তিনি ওসীয়্যত করেছিলেন। তিনি তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্বামী ছাড়াও দুই ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেছেন। তার নানা হযরত চৌধুরী আমীনুল্লাহ্ সাহেব (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। হায়দার আলী জাফর সাহেব লিখেছেন, আমি মুরব্বী হিসেবে কর্মক্ষেত্রে ছিলাম। বিভিন্ন সময়ে প্রায় বারো বছর তিনি একা ছিলেন, কিন্তু কখনো কোনো অভিযোগ করেন নি। একবারের ঘটনা, কোনো বিষয়ে তিনি খুবই চিন্তিত ছিলেন। যখন আমি জিজ্ঞেস করি, আমাকে পূর্বে কেন বলো নি? তখন তিনি বলেন, না বলার কারণ হলো কর্মক্ষেত্রে কাজে যেন কোনো বিঘ্ন না ঘটে। তিনি ফ্রাঙ্কফুর্টের বাইতুস্ সুবুহ্ হালকার প্রেসিডেন্টও ছিলেন। খিলাফত জুবিলীর বছর ফ্রাঙ্কফুর্টে লাজনার সদর হিসেবে কাজ করার সুযোগও পেয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে নামায রোযায় খুবই অভ্যস্ত ছিলেন। নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়তেন, কুরআন তেলাওয়াত করতেন, অনেক দান-সদকা করতেন ও যথাসময়ে চাঁদা পরিশোধ করতেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ ঘুটিয়ালিয়ার হাবিবুল্লাহ্ কাহলুন সাহেবের স্ত্রী নাসিম আখতার সাহেবার যিনি অতি সম্প্রতি মৃত্যুবরণ করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আল্লাহ্‌র অশেষ কৃপায় তিনি ওসীয়্যত করেছিলেন। মৃত্যুয় সময় ওসীয়্যতের সব হিসাব পরিষ্কার ছিল। জীবদ্দশাতেই হিস্যায়ে জায়েদাদ পরিশোধ করে দিয়েছিলেন। তিনি তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্বামী ছাড়াও ছয়জন ছেলে ও দুই মেয়ে রেখে গেছেন। এক মেয়ে তার জীবদ্দশাতেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। সন্তানদেরকেও খুব স্নেহ-ভালোবাসার সাথে রেখেছেন এবং শিক্ষা দিয়েছেন। ছেলেদের মধ্যে চারজন ওয়াকেফে যিন্দেগী। তার এক ছেলে নাভিদ আদিল সাহেব লাইবেরিয়ার মুরব্বী সিলসিলাহ্ ও মিশনারী ইনচার্জ, যিনি কর্মক্ষেত্রে থাকায় তার মায়ের জানাযায় অংশ নিতে পারেন নি। তিনি বলেন, তার পরিবারে তার পিতা মওলা বখ্‌শ সাহেবের মাধ্যমে আহমদীয়াত আসে যিনি দ্বিতীয় খলীফার যুগে বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। তার ধর্মীয় জ্ঞান খুবই ভালো ছিল। কখনো কখনো সাক্ষাৎকারীরা তাকে জিজ্ঞেস করত, আপনি কতদূর পড়াশুনা করেছেন? তার জাগতিক পড়াশোনা খুব নগণ্য ছিল। ধর্মীয় জ্ঞানের আগ্রহের ব্যাপারে প্রায়ই বলতেন, এটি তার মরহুম পিতার কারণে। কেননা তিনি দরস প্রভৃতি যা-ই মসজিদে শুনে আসতেন, ঘরে এসে আমাদেরকে অবশ্যই বলতেন। সুতরাং ঘরে যদি এরূপ ধর্মীয় আলোচনা হয় তবে (সন্তানদের ওপর) পিতামাতার সুপ্রভাব পড়ে। জামা'ত ও খিলাফতের সাথে তার সুগভীর ভালোবাসা ছিল। একান্ত নির্ভীক এবং ধর্মীয় আত্মাভিমানের অধিকারিনী ছিলেন। জামা'ত এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে কোনো প্রকার কথা সহ্য করতে পারতেন না। নিয়মিত নামায পড়তেন, তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত ছিলেন এবং নিয়মিত ইতিকাফে বসতেন, কেবল শেষ কয়েক বছর ব্যতীত। রমযানে তিন-চার বার পবিত্র কুরআন খতম দিতেন। চলাফেরার মাঝে দরূদ শরীফ ও যিকরে এলাহীতে রত থাকতেন। একবার অকস্মাৎ পড়ে গিয়ে তার পা ভেঙে যায়। আর তখন তার এক পুত্র (পত্র লেখক আদিল সাহেবের ছোট ভাই- অনুবাদক) সেখানে ছিলেন। ঠিক তার ফেরত আসার দিনই তিনি পড়ে যান আর পা ভেঙ্গে গেলে তিনি তাকে বলেন, তুমি তোমার ডিউটিতে যাও! অতঃপর তিনি পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে তার জামাতাকে ডেকে পাঠান, তার সাথে হাসপাতালে যান এবং তিনি তার পুত্রকে বলেন যে, ধর্মের সেবায় তৎক্ষণাৎ রওয়ানা দেয়া তোমার কর্তব্য।

নাভিদ আদিল সাহেবও বলেন, সাত বছর পরে ছুটিতে (বাড়ি গেলে) তার সাথে সাক্ষাৎকালে তিনি উপদেশ দেন যে, জীবন-মৃত্যু আল্লাহ্‌র হাতে। কেউ জানে না, কখন কার সময় আসে। তাই যদি এমন সময় আসে তবে তুমি

কখনো তোমার ডিউটি রেখে আসবে না, সেখানেই অবস্থান করবে যেখানে তুমি থাকবে। এজন্যই তিনি তার সেন্টারে বা কর্মস্থলেই ছিলেন। তিনি তার মায়ের জানাযায় অংশগ্রহণ করতে পারেন নি।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ বশীরাবাদ স্টেটের রশীদ আহমদ যমীর সাহেবের সহধর্মিনী মুকাররমা মুবারাকা বেগম সাহেবার। তিনিও কয়েক দিন পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার শ্রদ্ধেয় পিতা বাহাওয়াল হক সাহেবের মাধ্যমে পরিবারে আহমদীয়াতের সূচনা হয়। তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-র হাতে ১৯৪৮ সালে বয়আত করেছিলেন। তিনি অসংখ্য চারিত্রিক গুণাবলির অধিকারিনী ছিলেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও তাহাজ্জুদে নিয়মিত, জামাতের একজন নিঃস্বার্থ সেবিকা, পুণ্যবতী মহিলা ছিলেন। তিনি জামা'তের বেশ কয়েকটি পদে আসীন থেকে সেবাদানের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সদরও ছিলেন। প্রায় সারাটি জীবনই জামা'তের সেবায় কাটিয়েছেন। শত শত ছেলেমেয়েকে পবিত্র কুরআন পড়িয়েছেন। পর্দার ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। মেয়েদেরকেও পর্দার বিষয়ে উপদেশ করতেন। সৃষ্টির সেবায় তিনি সানন্দে অংশগ্রহণ করতেন। দরিদ্র ও বিধবাদের প্রয়োজনের প্রতি যত্নবান ছিলেন। অনেক দরিদ্র ও এতিম মেয়েদের বিয়ের ক্ষেত্রে সহায়তা করেছেন। বেশ কয়েকজন মেয়েকে সেলাই ও এমব্রয়ডারি শিখিয়েছেন। প্রতি জুমু'আর দিনে দুই ঘণ্টা পূর্বে মসজিদে চলে যেতেন। মহিলাদের অংশ নিজে পরিষ্কার করতেন। অতঃপর নফল নামায আদায় করতেন। তিনি অত্যন্ত ঈমানদার ছিলেন। তার সততার কারণে অনেক মহিলা তাদের গয়না-গাটি ও নগদ অর্থ তার নিকট আমানত (গচ্ছিত) রাখতেন। কখনোই তিনি কারো সাথে ঝগড়াঝাঁটি করেন নি, রুক্ষ ব্যবহার করেন নি, অভদ্রতা করেন নি। একান্ত উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারিনী ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি ওসীয়্যত করেছিলেন। তিনি যখন ওসীয়্যত করেন তখন নিজের পাশাপাশি মেয়েদেরকেও ওসীয়্যত করিয়েছেন। অনুরূপভাবে তিনি গ্রামে অনেক মহিলাকেও ওসীয়্যত ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি তার স্বামী ছাড়াও এক পুত্র ও পাঁচ কন্যা সন্তান রেখে গেছেন। মরহুমা সিয়েরালিওনের রাকীম প্রেসে কর্মরত মুরব্বী সিলসিলাহ্ মুকাররম উসমান আহমদ সাহেব এবং বুরকিনা-ফাসোতে কর্মরত মুরব্বী সিলসিলাহ্ মুকাররম সাআ'দাত আহমদ সাহেবের শাশুড়ি ছিলেন, আর তার দুই কন্যা যাদের বিয়ে মুরব্বী সাহেবদের সাথে হয়েছে তারা তাদের মায়ের জীবন সায়াহ্নে কাছে ছিলেন না। প্রত্যেকেই স্ব স্ব কর্মস্থলে ছিলেন। তার কন্যা আসিফা সাহেবা বলেন, আমি আমার স্বামী উসমান সাহেবের সাথে সিয়েরালিওনে সেবার সৌভাগ্য লাভ করছি। কর্মস্থলে থাকার কারণে আমি মায়ের জানাযা ও দাফনে অংশগ্রহণ করতে পারি নি। অনুরূপভাবে আমার ছোট বোন মরিয়ম বুশরাও বুরকিনা-ফাসোতে থাকে; সে-ও অংশগ্রহণ করতে পারে নি। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবল দান করুন এবং মরহুমার প্রতি আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা ও দয়াসুলভ ব্যবহার করুন। সন্তানসন্ততির পক্ষে তার দোয়াগুলো কবুল করুন। (আমীন)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডন কর্তৃক অনূদিত)